জেল হত্যাকাণ্ড: ইতিহাসের বাঁকবদল

মুস্তাফা মাসুদ

১৯৭৫ সালের পনেরোই আগস্ট কালরাতে স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার মাধ্যমে যে কলঙ্কিত ইতিহাসের সুচনা হয়েছিল, তারই ধারাবাহিকতায় জেল হত্যাকাণ্ড যেন অবধারিত এক বাঁকবদলের স্পষ্ট ইঙ্গিত হিসেবে প্রতিভাত হলো হতভাগ্য জাতির সামনে। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের মাত্র কয়েক মাসের মাথায় ৩ নভেম্বর জেলখানার অভ্যন্তরে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্ব দানকারী চার জাতীয় নেতা– সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ও এএইচএম কামরুজ্জামানকে হত্যা করা হলো রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায়। বঙ্গবন্ধুর শাহাদাতের পরেও খুনিরা এবং তাদের দোসর-মিত্ররা নিজেদের অবৈধ পথকে নিষ্কণ্টক ও নিরাপদ মনে করছিল না বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য সহকর্মী চার জাতীয় নেতার শরীরী উপস্থিতির কারণে। যদিও তাঁরা তখন জেলে অন্তরীণ, তবুও মোশতাক গং সব সময় তাঁদেরকে নিয়ে আতঙ্কে তটস্থ ছিলো। ওই চক্র অনেককে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার টোপ দেয়। কেউ কেউ সেই টোপ গিলেও ফেলে। অনেকে সেদিন খুনিদের সাথে আঁতাত করে প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্যে। কিন্তু সিংহহৃদয় চার জাতীয় নেতা অবৈধ মোশতাককে সমর্থন করলেন না। তার সাথে হাত মেলালেন না। আর তখনি তাঁদের ভয়াবহ নিয়তি নির্ধারিত হয়ে যায়। কারাগারে বন্দি নেতাদেরকেও খুনিচক্র তাদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ মনে করল। বেঁচে থাকলে সময়-সুযোগমতো আবারও তাঁরা জনগণকে সুসংগঠিত করবেন। ফিরিয়ে আনবেন মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশের আদর্শকে। তখন অবৈধ ক্ষমতার বালিরবাঁধ কোথায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে দুর্বার গণ-জোয়ারে! তাছাড়া তাঁদের অবর্তমানে বাংলাদেশকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারায় পরিচালনা করার মতো যোগ্য নেতাও থাকবে না– ভেবেছিল তারা। ধূর্ত মোশতাক আর তার সাঙ্গোপাঙ্গরা তাই আর দেরি করেনি। সব আইন-নীতি-নিয়ম-লাললজ্জা আর ন্যূনতম মানবিকতাবোধকে বিসর্জন দিয়ে কারাগারের বদ্ধ ঘরে চারটি নিরস্ত্র মানুষকে গুলি করে হত্যা করা হলো দানবীয় বিভৎসতায়! তথাকথিত, পুতুল রাষ্ট্রপতি মুশতাক খুনিদের 'সূর্য-সন্তান' হিসেবে আখ্যায়িত করে।

জেল হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনাকারীদের উদ্দেশ্য ছিলো সুদূরপ্রসারী। মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা যে অসাম্প্রদায়িক উদার মানবিক ধ্যান-ধারণার লালন-পোষণ, তাকে নির্বাসনে পাঠানো এবং সদ্যস্বাধীন দেশটাকে পুনরায় মৃত পাকিস্তানের কঙ্কালের সাথে জুড়ে দিয়ে তাতে পুরনো ধ্যান-ধারণার পুনরুজ্জীবন ঘটানো। আর সেজন্য প্রথমে প্রয়োজন ছিলো সেইসব মানুষগুলোকে সরিয়ে দেওয়া, যারা স্বাধীন বাংলাদেশের প্রকৃত চেতনা ও প্রাণপ্রবাহকে ধারণ করেন নিজেদের মধ্যে– কোনো বৈরী ঝড়-ঝঞ্ঝাই তাঁদেরকে টলাতে পারে না। এই অনমনীয় আদর্শকে ধারণ ও লালন করার 'অপরাধেই' বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহচর চার নেতাকে প্রাণ দিতে হলো কারান্তরালে। তাঁরা জীবন দিলেন, কিন্তু ইতিহাসের উল্টোরথের সারথিদের সাথে আপস করেননি। তাঁরা রক্ত দিয়ে একদিকে জাতির পিতার রক্তদানকে আরো মহিমান্বিত, আরো তাৎপর্যময় করে তোলেন; অন্যদিকে অন্যায়ের কাছে মাথানত না করে মুক্তিযুদ্ধের মহিমা ও স্বাধীন বাঙালি জাতির মর্যাদাকে আরো সমুন্নত করে গেছেন। আর তাইতো তাঁরা বাংলার ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। মহান নেতা বঙ্গবন্ধুর পাশাপাশি জাতি তাঁদেরকেও স্মরণ করে অপরিসীম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায়। আর যারা সেদিন বঙ্গবন্ধু হত্যাসহ জেলখানায় চার জাতীয় নেতাকে হত্যায় জড়িত ছিল, সমর্থন দিয়েছিল কিংবা নিষ্ক্রিয় ছিল অথবা খুনিচক্রের সাথে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় হাত মিলিয়েছিল, জাতি তাদেরকেও ভোলেনি। তাদের প্রতি জাতির সক্ষোভ ঘৃণা আর নিন্দাবাদ আজও বর্ষিত হয়। জাতির নিন্দা আর অভিশাপ মাথায় নিয়েই তাদের অনেকে বঙ্গবন্ধু হত্যার অভিযোগে ফাঁসির দড়িতে ঝুলেছে; পালেরগোদা খন্দকার মোশতাক নিজগৃহে স্বেচ্ছানির্বাসিত অবস্থায় অন্তর্জালায় দগ্ধ হয়ে ১৯৯৬ সালের ৫ মার্চ মৃত্যুবরণ করে; আর বেশ কয়েকজন ঘাতক অপরাধের বোঝা মাথায় নিয়ে বিদেশে পলাতক জীবনযাপন করছে–এদের একজন আবার বিদেশেই মারা গেছে; একজনকে বিদেশ থেকে দেশে ফিরিয়ে এনে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে।

৩ নভেম্বর, ১৯৭৫। সকাল বেলা। বিমান বাহিনীর কয়েকটি ফাইটার জেট প্লেন ভীতিজনকভাবে বঙ্গভবনের ওপর দিয়ে আকাশে উড়তে থাকে। অবস্থা বেগতিক দেখে মোশতাক ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বাধীন সমঝোতাকারী দলের সঙ্গে বৈঠকে এক সমঝোতায় আসে। সমঝোতা অনুযায়ী ফারুক-রশিদ গং আত্মসমর্পণ এবং দেশত্যাগ করতে সম্মত হয়। কিন্তু ইতোমধ্যে ৩ নভেম্বর রাতে খুনি রশিদ এবং অন্য খুনিদের সহায়তায় মোশতাক তার আসল কাজটি সেরে ফেলে– কারাভ্যন্তরে চার জাতীয় নেতাকে নির্মমভাবে হত্যা করার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন করে। এসময় তারা বুঝে ফেলেছিল যে, তাদের সময় শেষ। তাই শেষ কামড়টি দিল তারা জাতির আশাহত বুকে। যোগ্য নেতার অভাবে দেশ যেন চিরতরে মুখথুবড়ে পড়ে বিভ্রান্তি আর জগাখিচুড়ির নোংরা নর্দমায়, সেটি পাকাপোক্ত করার জন্যই খুনিরা জাতির চার ধ্রুবতারাকে হত্যা করে। হত্যা মিশন সম্পন্ন হওয়ার পর সে-রাতেই খুনিরা বিমানে ব্যাংককের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করে। বঙ্গবন্ধুর পর চার জাতীয় নেতাকে হত্যার মধ্য দিয়ে উদার অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের শেষ সম্ভাবনাটুকুও যেন তিরোহিত হয়ে গেল। এখানে আমরা বিস্ময়ের সাথে লক্ষ করি যে, ৩ নবেম্বর মোশতাক গং যে-উদ্দেশ্যে জেল হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল, তার সাথে পুরোপুরি সাদৃশ্য পাওয়া যায় একাত্তরে বুদ্ধিজীবী হত্যার উদ্দেশ্যের। পাকিস্তানি হানাদার আর তাদের দোসর আলবদর বাহিনী একাত্তরে চেয়েছিল জ্ঞানী-গুণীদের হত্যা করে দেশকে মেধাশূন্য করতে; বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে পঙ্গু করতে। অনুরূপভাবে পঁচাত্তরের খুনিরাও চেয়েছিল মেধাবী ও দেশপ্রেমিক শীর্ষ রাজনীতিবিদগণকে হত্যা করে রাজনীতির ময়দান মেধাশূন্য করতে। তারা কেউ পাকিস্তানি ছিল না; বাঙালি হয়েই তারা একাত্তরের ঘাতকদের মতোই অপকর্ম করল। একাজে তারা অনেকটাই সফল হয়েছিল। পঁচাত্তর-পরবর্তী রাজনীতির ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্য-চারিত্র্য পর্যবেক্ষণ-বিশ্লেষণ করলে সহজেই আমরা তা বুঝতে পারি।

পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট-পরবর্তী বৈরী-ঝোড়ো সময়গুলোতে বঙ্গবন্ধু হত্যার মতো ৩ নভেম্বরের জেল হত্যাকাণ্ডের তদন্ত আর বিচারও নানান ষড়যন্ত্র আর হিপোক্রেসির কানাগলিতে আটকে ছিলো। সেসময় লালবাগ থানায় জেল হত্যাণ্ডের বিষয়ে একটি মামলা দায়ের হয়। কিন্তু দীর্ঘ একুশ বছর– ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার আগ পর্যন্ত তার তদন্ত ও বিচারকাজ আর এগোয়নি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার গঠিত হওয়ার পর জেল হত্যা মামলা আবার চালু করা হয়। আট বছর বিচার চলার পর ২০০৪ সালের ২০ অক্টোবর এই মামলার রায় হয়। অভিযুক্ত বিশ সাবেক সেনা কর্মকর্তার মধ্যে ১৫ জনকে দোষী সাব্যস্ত করে ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালত রায় প্রদান করেন। এদের মধ্যে তিন জনকে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড এবং ১২ জনকে যাবজ্জীবন কারদণ্ড দেওয়া হয়; পাঁচজনকে খালাস দেওয়া

হয়। আসামিরা উচ্চ আদালতে আপিল করলে ২০০৮ সালের ২৮ আগস্ট আপিলের রায় হয়। এই রায়ে কেবল সার্জেন্ট মোসলেম উদ্দীনের মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখা হয় আর নিম্ন আদালতে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত অন্য দুই

অভিযুক্ত দফাদার মারফত আলী শাহ ও এলডি দফাদার মোহাম্মদ আবুল হাশেম মৃধাকে খালাস দেওয়া হয়।
এই বিচারকে 'রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্ট' ও 'প্রহসন' বলে অভিহিত করে এই বিচারের রায়কে প্রত্যাখ্যান করা হলো। তাদের পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয় যে, এতে জেল হত্যা ষড়যন্ত্রের মূল পরিকল্পনাকারীদের কাউকেই শাস্তি দেওয়া হয়নি। তারা জাতীয় ইতিহাসের এই বর্বর হত্যাকাণ্ডের পুনঃ তদন্ত ও বিচার দাবি করেন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, জেল হত্যার অভিযোগ থেকে খালাস পেলেও বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় অভিযুক্ত চার আসামি লে. কর্নেল (বরখাস্ত) সৈয়দ ফারুক রহমান, লে. কর্নেল (অব.) শাহরিয়ার রশিদ খান, মেজর (অব.) বজলুল হুদা ও লে. কর্নেল একেএম মহীউদ্দীন আহমেদের ফাঁসি কার্যকর করা হয় ২০১০ সালের ২৭ জানুয়ারি। ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বরের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে চৌদ্দ দলীয় জোট বিপুলভাবে জয়ী হয়ে সরকার গঠন করে। এরফলে জেল হত্যা মামলা পুনর্বিচারের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়। হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে আপিল রুজু করা হয়। ফলে পুনর্বিচারের কার্যক্রম পুনরায় শুরু হয়। মাননীয় আপিল বিভাগ ২০১৪ সালের ৩০ এপ্রিল এক সংক্ষিপ্ত রায়ে পূর্বে প্রদত্ত হাইকোর্টের রায় বাতিল করে দেন এবং ২০০৪ সালে প্রদত্ত নিম্নআদালতের রায় বহাল রাখেন; অর্থাৎ নিম্ন আদালতে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত তিন আসামির মৃত্যুদণ্ড এবং বারো আসামির যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বহাল রাখেন।

ছয় সদস্যবিশিষ্ট সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চ জেল হত্যাকাণ্ড মামলার রায়ে উল্লেখ করেন যে, রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রই ঘাতকদেরকে অনুপ্রাণিত করে কারা-অভ্যন্তরে এমন ঘৃণ্য হত্যাকাণ্ড ঘটাতে। নিহত এই জাতীয় নেতৃবৃন্দ প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রীয় হেফাজতে ছিলেন; এবং এমন একটি দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া খুবই দুষ্কর যে, শান্তিপূর্ণ অবস্থায় একটি সরকার নির্দিষ্ট ব্যক্তিদেরকে– যাদের এহেন কাপুরুষোচিত হত্যাকাণ্ড ঘটানোর কোনো আইনগত কর্তৃত্ব নেই– নির্দেশ দিয়েছে বা উৎসাহিত করেছে। সুতরাং যে কেউ নির্দ্বিধায় বলতে পারে যে, এটি ছিলো আমাদের কষ্টার্জিত স্বাধীনতার অর্জনগুলোকে ধ্বংস করার এক সুপরিকল্পিত পদক্ষেপেরই অংশ। খুনিরা যে-ষড়যন্ত্রকারীদের স্বার্থে এমন অপরাধমূলক কাজ করেছিল, সেই ষড়যন্ত্রকারীরা এমনভাবে পরিকল্পনা এঁটেছিল, যাতে এই দেশের জনগণ যে-উদ্দেশ্যে মুক্তিযুদ্ধ করেছিল এবং স্বপ্ন দেখেছিল– তার সবটাই ধ্বংস হয়ে যায়।

তাদের এই উদ্দেশ্য সাময়িকভাবে সফল হয়েছিল। পঁচাত্তরের পর জাতি কলঙ্কিত ইতিহাসের কানাগলিতে হাবুডুবু খেতে থাকে; জাতির ইতিহাসে চলতে থাকে মিথ্যা, হঠকারিতা আর গোঁজামিলের রমরমা। রাজাকারেরা রাতারাতি হিরো বনে যায়; মুক্তিযোদ্ধারা হয়ে যান অবহেলিত, অচ্ছ্যুৎ। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়। একারণেই পঁচাত্তরের বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড আর জেল হত্যাকাণ্ড ছিলো এক সুতোয় গাঁথা এবং জাতীয় ইতিহাসের বাঁকবদলের এক অপরিহার্য নিয়ামক; যার ভস্মাচ্ছাদিত জঞ্জাল থেকে ফিনিক্স পাখির মতো অভ্যুদয় ঘটেছে শেখ হাসিনার গৌরবময় অভিযাত্রা।

#

পিআইডি ফিচার